বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ

ঘোষণাপত্র

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ!

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

ঘোষণাপত্র

নতুন বিপ্লবের অপেক্ষায় বাংলাদেশ ঃ

সময় বদলায়। বদলায় জনগণের চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণে দরকার যুগোপযোগী ধারণাকে ধারন করে নতুন সমাধান। দুঃখজনক হলেও সত্য চলমান রাজনৈতিক দলগুলো সেই সমাধানের দিকে না হেঁটে জাতিকে সমস্যার দুষ্টচক্রে বেঁধে ফেলেছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম ডাক দিয়েছে নতুন এক বিপ্লবের। যে বিপ্লবের লক্ষ্য জনগণের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা।

তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে ভরা উদ্যমী এক দেশ বাংলাদেশ। তারুণ্যের উচ্ছল শক্তি, উদ্দ্যম, কর্ম-স্পৃহা আর সৃজনশীলতাই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসন দিয়েছে। এই শক্তির সর্বোচ্চ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার জরুরী।

আমাদের রাজনৈতিক পথপরিক্রমা কখনোই মসৃন ছিল না। এখন সময় অন্ধকারকে পিছনে ফেলে আলোর পথে যাত্রা শুরু করার। এখন সময় গত সাড়ে চার দশকের ভূল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করার।

উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে তৃনমূল পর্যন্ত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ প্রত্যেক নাগরিকের দোরগোড়ায় নাগরিক ক্ষমতায়নের ধারনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই জনগণের শ্রম, উদ্যোগ আর মেধাভিত্তিক সৃজনশীলতার মাধ্যমেই বাংলাদেশের সব অর্জন। তাই আগামীর লক্ষ্য অর্জনে আমাদের পরিপূর্ণ নাগরিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমরা এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যা বহুমাত্রিকতাকে ধারন করে এবং সকলের সম-অংশগ্রহণের সুযোগ, মর্যাদা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে।

আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন ছিল গণতন্ত্র এবং সম-সুযোগের অধিকার। এই স্বপ্ন এখন প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের। আমাদের রাজনীতিবীদদের থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কথার ফুলঝুড়ি ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই নাই।

রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ ঃ

পথে-প্রান্তরে, ফসলের মাঠে, কলকারখানায় অসংখ্য কৃষক-শ্রমিক ভাই-বোন এবং সকলের পিছনে অজস্র মমতাময়ী মা-দের আশীর্বাদে আজ আমরা মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশের মহান সংবিধানের প্রস্তাবনা- জনগণের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাকে ধারণ করেই রচিত হয়েছে ঃ

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ২[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

৩[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;]

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভুমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই বংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু ক্রমাগত রাজনৈতিক সংঘাত এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত আমাদের সংবিধানে বর্ণিত এই মহান লক্ষ্য অর্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এর ফলশ্রুতিতে সমাজে বিভেদের সংস্কৃতির সৃষ্টি, আর তার কারণেই বর্তমান এই রাজনৈতিক সংকট।

গণতন্ত্র শূণ্যতা ঃ

আমরা এখন গণতন্ত্রের সংকটে আছি। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শুরু থেকেই সংগ্রাম করেছি। ব্রিটিশ শাসনামলের পর পাকিস্থানী সামরিক জান্তা- গণতন্ত্র অর্জনের লড়াই অব্যাহত রেখে আমরা সংগ্রাম করে গেছি। অগণতান্ত্রিক শক্তির কালো হাতের হস্তক্ষেপকালীন সময় ছাড়া সাধারন নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে আমরা হয়তো কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের পথে হেটেছি, তবে নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে জনমনে সবসময়ই প্রশ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো এই নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে গঠিত সরকার জনগণকে কাঙ্খিত জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র উপহার দিতে পারে নাই।

শুধু জবাবদিহিতার অভাবের কারণে আমাদের গণতন্ত্রের এই সংকট নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শের মেরুকরণ এবং বলয়ের প্রভাবের কারণে রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। দেশের জনগণ আজও সত্যিকার গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত।

দুর্নীতি ও লুটতরাজ ঃ

ক্ষমতাশীলদের পেটোয়া বাহিনীর তান্ডব ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের নগ্ন খেলা থেকেই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি। লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব থেকে আমরা সবসময় বঞ্চিত হয়েছি। রাজনীতিতে ক্ষমতার বলয় তৈরী হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদে মেধাশূণ্য ব্যক্তিদের প্রাধান্য বেড়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহের সর্বোচ্চ পদধারী নেতৃবৃন্দ স্বীয় ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সরকারি দপ্তরসমূহে রাজনৈতিক সুপারিশে নিয়োগ ও পদোন্নতি বেড়েছে ফলশ্রুতিতে বেসামরিক প্রশাসনে নিজ দলের প্রতি আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও তারুণ্যের অবক্ষয় ঃ

জাতীয় রাজনীতির সহিংসতার প্রভাব তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করছে। জাতির ভবিষ্যত যে তরুণ সমাজ তারা আজ এমন এক রাজনীতিতে অভ্যস্ত যেখানে রয়েছে রাজপথে অবৈধ অস্ত্র আর শক্তি প্রদর্শনের খেলা। বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলের ছাত্র ও যুব বাহিনী যেন এক

মূর্তিমান আতংক। এই রাজনৈতিক দলগুলো তরুণ নেতৃত্ব তৈরীর করার ব্যাপারে বরাবই উদাসীন।

আইনের শাসনের অভাব ঃ

জবাবদিহিতার অভাব, দুর্নীতি আর রাজনৈতিক সহিংসতা থেকে আইনের শাসনের শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি মারাত্মক অপরাধের ধরনই ছিল স্বেচ্ছাচারীতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যা মোটেও মানানসই নয়। আর এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি।

খুনী, ধর্ষক আর পুকুরচুরির খলনায়করা বিশেষ মহলের ছত্র ছায়ায় সবসময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে হোক অথবা যথাযথ প্রশিক্ষনের অভাবেই হোক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর হীন স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে আসছে।

বাক-স্বাধীনতার অভাব ঃ

আমাদের মহান সংবিধানের বর্ণিত বাক-স্বাধীনতার অধিকার আজ অবরুদ্ধ। গণমাধ্যমের উপর অদৃশ্য কালো হাতের ছায়া। কালো আইনের প্রভাব এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় মিডিয়ার মালিকানা দেওয়ার কারণে ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন ক্ষুন্ন হচ্ছে, তেমনি গণমাধ্যমও আপোষহীনভাবে কাজ করতে পারছে না।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে না লাগানো ঃ

অসীম অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দেশ আমদের প্রিয় বাংলাদেশ । এতদসত্ত্বেও আয়ের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি। শহরের অর্থনীতির উন্নয়নের সুফল গ্রাম পর্যায়ে পৌছানো যায়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্রতার হার আর উদ্যোক্তা সৃষ্টির সুযোগের তারতম্য রয়েছে। সংখ্যার দিক বিবেচনায় বরিশাল অঞ্চলে এখন পর্যন্ত দারিদ্রতার হার সবচেয়ে বেশী, ৩৫.৬% মানুষের অবস্থান এখানে দারিদ্রসীমার নীচে, সেখানে ঢাকা অঞ্চলে এই হার ১৯.৯%।

শিল্পায়নের সুফল থেকে প্রান্তিক কৃষক এবং তাঁদের পরিবার সবসময়ই বঞ্চিত থেকে গেছে। মূলধারার অর্থনীতিতে এদেরকে এখনো সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। উজ্জল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এখনও শিল্পবান্ধব কোন নীতিমালা তৈরী হয়নি। গত কয়েক দশক ধরে অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমবাজারের উপর ভিত্তি করে আমাদের শিল্পক্ষেত্র পরিচালিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এখন সময় এসেছে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরী করা এবং সেবা খাতের দিকে নজর দেয়া।

কিন্তু এধরনের অগ্রগতি অর্জনের জন্য সরকার অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষি এবং শিল্পখাতে ব্যপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করে আমাদের অর্থনীতিকে বড় অর্জনের পথে নিয়ে যেতে এখনই সময় অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনার। অঞ্চলভেদে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা কল্যাণমুখী অর্থনীতির জন্য জরুরী।

অসহায় তরুণ সমাজ ঃ

আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর কথার ফুলঝুড়িতে হতাশ। তারুণ্যের ক্ষমতায়নের জন্য উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ এবং মানের ঘাটতি আজ এক বড় ক্ষত। যদিও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মজুরীর কারণে আমাদের এক বড় সুযোগ এনে দিয়েছিল, কিন্তু যথার্থ নীতিমালার অভাবে তা আমরা কাজে লাগাতে পারছিনা।

পরিবারের সাধ্যের বাহিরে খরচ করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়েও চাকুরী পাওয়া যেন সোনার হরিণ। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হল উচ্চ গ্রেডের আধিক্য। গত এক দশকে আমরা দেখেছি ডিগ্রীর সাথে সাথে উচ্চতর গ্রেডের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রবেশকারী শিক্ষিত তরুণদের সংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হচ্ছে না।

একটা সময় ছিল যখন সরকারি চাকুরী পাওয়াকে বড় সম্মান বলে বিবেচনা করা হতো, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্ল্যেখযোগ্য পরিমান ঘুষ প্রদান না করলে এখন সরকারি চাকুরী মিলছে না, গ্রামের তরুণ সমাজ কৃষি বা তাঁদের চিরায়িত কর্মসংস্থানের উপযোগী যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এদের জীবনমাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম জনগণের দল ঃ

প্রত্যেক বাংলাদেশীর কণ্ঠসর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এনডিএম। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অনেকে দীর্ঘদিন ধরে "রাজনীতি" শব্দটাকে কলুষিত করে আসছে। অদৃশ্য শক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা পেশী শক্তির জোরে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা গণতন্ত্র এবং আত্মত্যাগের মহান মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এখন সময় "রাজনীতি" শব্দটির মহান মর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এখন সময় জনগণের কাছে তাদের ক্ষমতাকে ফিরিয়ে দেয়া।

এনডিএম-এর মূলনীতি ঃ

চারটি অপরিবর্তনীয় মূলনীতির উপর এনডিএম প্রতিষ্ঠিত- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, স্বাধীনতার চেতনা এবং জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র।

জনগণের মতামতের ভিত্তিতে আমরা জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো, যেকোন মূল্যে আমরা দেশের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করবো। আমরা সরকারের পরিধি হ্রাস করবো এবং কার্যকর জনবান্ধব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা সামাজিক সুরক্ষা জাল নিশ্চিত করবো। কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করবো। সহজ শর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে গ্রামীণ দারিদ্রতার হার কমিয়ে আনবো। ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ তহবিল সৃষ্টি, সুষম করনীতি প্রণয়ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবো।

১. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ

'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' প্রকৃত ধারণার অভাব এবং 'জনগণের গণতন্ত্রের' নামে কিছু দলের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা অনেকের চোখে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ধারনাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই সুযোগ নিয়ে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নিয়ে কুটখেলায় মেতেছে কিছু দল।

এছাড়াও বিভিন্ন কলা-কৌশলে দলগুলো 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণাকে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' -এর ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। যেখানে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' আমাদের গৌরবজ্জল অতীতকে মনে করিয়ে দিলেও বর্তমানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে কিছু দল 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর ভুল ধারণা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

জনগণ-এই দুটি ধারণার প্রচারনায় বিভ্রান্ত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এধরণের কৃত্রিম বিভাজন এবং আমাদের জাতীয় মর্যাদা ও ইতিহাসের গৌরবের প্রতিচ্ছবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

এনডিএম 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' বলতে উগ্র ধারনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন চেতনা বোঝায় না, বরং নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য এবং জনকল্যাণের ধারণাকে লালন করে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলতে কোন উগ্র দেশাত্ববোধ অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীকে বাদ দেয়া বোঝায় না। সকল বর্ণ-গোষ্ঠীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে, একই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা নাগরিকত্বের অটুট বন্ধন আর একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা এবং মর্যাদার ধারনাই

হলো জাতীয়তাবাদ। আমাদের নিজস্ব সত্তা থেকেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জন্ম যার উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে এনডিএম।

(ক) ভৌগলিক সার্বভৌমত্ব ঃ

আমরা আমাদের ভূ-খন্ডের অখন্ডতায় বিশ্বাস করি। ভূ-খন্ডের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোন আপোষ আমরা সহ্য করবো না। অন্যদিকে এই ভূ-খন্ডের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমাদের সাথে জড়িত। এই ভূ-খন্ডই আমাদের পরিচয় এবং আমাদের সব মৌলিক অধিকার পূরনের ঠিকানা। সার্বভৌমত্বের উপর কোন আঘাত আমরা সহ্য করবো না।

(খ) বহুমাত্রিকতা ঃ

বহুমাত্রিকতাকে ধারন করে জাতি হিসাবে আমরা গর্বিত। আমরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। জাতি হিসাবে আমরা এক অভিন্ন বিশ্বাসের উপর নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে চাই। আমাদের অন্যতম শক্তি হলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একসুতায় গাঁথা। কোন এক নির্দিষ্ট পরিচয়ের উপর আমাদের ভিত্তি নিহিত নয়। বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের শুভ প্রচেষ্টা ।

(গ) বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ

নিজেদের সঠিক ইতিহাসকে মূল্যায়ন অথবা স্বীকৃতি না দিয়ে কোন জাতিই তাঁর জাতিস্বত্তাকে প্রকাশ করতে পারে না। আমাদের রয়েছে হাজার বছেরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। আমাদের সব জাতীয় বীর এবং যাঁরা জাতীয় গর্ব তাঁদের প্রতি আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যারা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছে এবং আমাদের সব ধরনের লড়াই-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে সবাই আমাদের মহান জাতীয় বীর।

সেইসাথে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে যারা গড়ে তুলেছে তাঁরাও আমাদের জাতীয় গর্ব।

(ঘ) বাংলা- আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি ঃ

আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মাতৃভাষা বাংলা, আঞ্চলিক প্রভাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ধর্ম বিশ্বাস ইসলামের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় ঘটায় এমন সবকিছু যা আমরা

কালের পরিক্রমায় ধারন করেছি সেসবও আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমরা এসব কিছুকেই লালন করি।

আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হিসাবে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার সাথে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

(ঙ) উদ্ভাবন ঃ

বর্তমানে আমরা প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বাস করছি। গ্রাম পর্যায়েও এখন বৈশ্বিক যোগাযোগ সম্ভব। কৃষকরা তাঁদের মুঠোফোনের মাধ্যমেই দূরতম বাজারে পণ্যের মূল্য যাচাই করতে পারে। গ্রামের তরুণ সমাজ আজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সরকারি ব্যবস্থাপনায় আমরা এখনো আধুনিক হতে পারি নাই। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও আমাদের প্রযুক্তিকে স্বাগতম জানাতে হবে। উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি দিয়ে শাসন ব্যবস্থায় সবসময় জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করতে হবে।

২. ধর্মীয় মূল্যবোধ ঃ

আমাদের রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর ধর্মীয় সহনশীলতার এক অনন্য ইতিহাস। কিছু কু-চক্রী মহলের অপরাজনীতির ফলে আমাদের এই অনন্য অর্জনে কালিমা লেপন করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উগ্র মতবাদের উপর কোন রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব আমাদের মহান সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী।

ভোটের রাজনীতির হিসাব কষে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা আমাদের জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম, বিশ্বাস আর আবেগকে পুঁজি করে একটি অপ-রাজনৈতিক মেরুকরণ করার চেষ্টা করেছে। নিজেদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী। শান্তি এবং সহনশীলতার ধর্ম হলো ইসলাম এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার দেশ হিসাবে আমরা সেই চেতনাকে ধারন করি।

(ক) শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে সামাজিক এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ঃ

ধর্ম থেকেই আমাদের মূল্যবোধগুলো তৈরী হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌রাব্বুল আলআমিন তথা স্রষ্ঠার কাছে পরিপূর্ণ আত্নসমর্পন করাই ইসলামের সুমহান আদর্শ। আমাদের মূল সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেয়ে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে, যার ফলে প্রতিনিয়ত সামাজিক অপরাধ

বেড়ে চলেছে। এই মূল্যবোধগুলো আমরা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিমন্ডলে ফিরিয়ে আনতে চাই।

(খ) গণতান্ত্রিক আদর্শ ঃ

পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের গণতন্ত্রের প্রচারক ও রক্ষক বলে দাবী করলেও গত দুই হাজার বছর ধরে তাঁদের মধ্য গণতন্ত্র ছিল না, অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়ে এসেছে।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের প্রচারনা ইসলাম বিরোধী বিশেষ ধারনা তৈরীতে ভূমিকা রেখেছে, অন্যতম বৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে শান্তি ও সহনশীলতার ধর্ম হিসাবে ইসলামকে সুপরিচিতি দেয়া আমাদের কর্তব্য।

(গ) নারীর প্রতি মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঃ

উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সমাজের সবক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আমরা নারীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম, নারীর মর্যাদা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার শিক্ষা দেয়। আমরা বিশ্বাস করি নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

৩. স্বাধীনতার চেতনা ঃ

আমরা বিশ্বাস করি **১৯৭১** সালে এই জাতির সাত কোটি সন্তান একসাথে লড়াই-সংগ্রাম করেছে এবং একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে। স্বাধীনতার চেতনা কোন এক বিশেষ মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একক সম্পত্তি নয়। আমরা বিশ্বাস করি এই বীরের জাতি যুদ্ধ করেছিল জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্রের জন্য, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সব ধরনের গোষ্ঠী স্বার্থের ছোবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

(ক) গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থ বিরোধী ঃ

বাংলাদেশী জনগনকে গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে জিম্মি করে রাখা হয়েছিলো, যার বিরুদ্ধে আমরা **১৯৭১** সালে লড়াই করেছি। এই মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো যাতে আমরা এই জিম্মি দশা থেকে মুক্ত হতে পারি এবং পুনরায় আর কোন অপশক্তি যাতে আমাদের এই পবিত্র ভূমিকে দখল করে আমাদের জিম্মি করতে না পারে। আর তাই আমরা বিশ্বাস করি, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে হীন স্বার্থে ক্ষমতায়ন করা

আমাদের স্বাধীনতার চেতনা পরিপন্থী। সুযোগ সন্ধানী কোন গোষ্ঠীর নিজ স্বার্থের কাছে আমরা নিজেদের আর বিলিয়ে দেবো না।

(খ) সবধরনের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ঃ

পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা আমাদের মৌলিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছিল বলেই আমাদের মুক্তিকামী ভাই-বোনেরা জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। আর তাই স্বাধীনতার চেতনা বলতে আমরা বুঝি জনগনের সব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। রাষ্ট্র শুধু জনগনের সাথে হওয়া অন্যায় বা কোন অপরাধের প্রতিকারই করবে না বরং খাদ্য, শিক্ষা এবং সুযোগের সমতার নিশ্চয়তাও প্রদান করবে।

(গ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, জীবনদানকারী এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী সকলকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস করি, কিছু বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিজ স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারনে আমরা সেই মহান কর্তব্য পালন থেকে পিছু হটেছি এবং আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। এখনই সময় ভুল শুধরে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী সকলের মর্যাদা নিশ্চিত করা।

৪. জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র ঃ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যেকোন রুপেই হোক আমরা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র দেখেছি। কিন্তু নির্বাচিত সরকারগুলো জনগণের প্রত্যাশা পূরন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারন আমাদের রাজনীতিতে গণতন্ত্র নামে মাত্র উপস্থিত। নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব সবসময় লক্ষনীয়। শুধুমাত্র জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্রই রাজনীতি এবং সরকার পরিচালনাকে জনগনের কল্যাণে কাজ করাতে বাধ্য করতে পারে। আমরা রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থায় পরিপূর্ণ জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করি। আমরা সকলের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি যাতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারনে আমরা কারো কাছে জিম্মি হয়ে না পড়ি।

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ঃ

আমরা সরকারী সব প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জনগনের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চাই। আমরা চাই রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ স্বাধীনভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগনের কাছে জবাবদিহি করবে। এছাড়াও আমরা চাই, রাজনৈতিক সরকারের মূলভিত্তি রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হবে এবং দলের অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে।

(খ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া নাগরিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকারকে প্রকৃত ক্ষমতায়ন করলেই জনগনের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। বর্তমানে সব রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক, এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে জনসেবা কখনোই প্রত্যাশামত পাওয়া সম্ভব নয়।

(গ) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ঃ

বর্তমানে আমাদের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ৫১% ভোট পেয়ে একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও বাকি ৪৯% শতাংশ জনগন উপেক্ষিত হয়ে আসছে।

এজন্য আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা তৈরী করতে চাই যেখানে উচ্চ কক্ষের সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হবে। উদাহরণ স্বরুপ, কোন রাজনৈতিক দল ১০% ভোট পেলে উচ্চ কক্ষে ১০% আসন লাভ করবে।

(ঘ) সামাজিক সুরুক্ষা জাল ঃ

কোন গণতন্ত্র এমনকি জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্রও অর্থবহ হয় না যদি নাগরিকের সব মৌলিক চাহিদা পূরণ করা না হয়। নাগরিককে শুধু অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচানোর মধ্যেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয় না। আমাদের মত স্বল্প উন্নত দেশের গণতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকের সব মৌলিক অধিকার যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সরকারগুলো এখনো বৃহৎ পরিসরে জনগনের জন্য সামাজিক সুরক্ষা জাল সৃষ্টি করতে পারে নাই।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম এর প্রতিশ্রুতি ঃ

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম একটি জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে চায় যেখানে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামো দেশের তরুণ সমাজের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করবে। এজন্য আমাদের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র বলতে শুধু ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর সরকার পরিবর্তনকেই বোঝায় না। আমরা সরকারের সব কর্মকান্ডে শুধু অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষন নয়, জনগনের মতামতের প্রতিফলন দেখাবো।

আমরা জাতীয় রাজনীতিতে ব্যপকভিত্তিক পরিবর্তন আনবো। আত্নত্যাগের মহানব্রতকে আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। দূর্নীতি আর বর্বরতার পুনারাবৃত্তি আমরা আর দেখতে চাই না।

(ক) সবার উপর "বাংলাদেশ" ঃ

১. সার্বভৌমত্ব এবং মর্যাদা ঃ

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা আপোষহীন এবং আমাদের জাতিগত মর্যাদার ক্ষেত্রে আমরা কোন সমঝোতা মেনে নেব না।

২. "নাগরিক" ধারনা ঃ

আমরা নিশ্চিত করবো কোন নাগরিকই তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। নাগিরকত্বের অবস্থান আমাদের কাছে সব কিছুর উর্ধে এবং নাগরিকত্বের মর্যাদার ক্ষেত্রে সংবিধান স্বীকৃত আদালত কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ ব্যতীত অন্যকোন হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করবো না।

(খ) গণতন্ত্র এবং নাগিরক অধিকার ঃ

১. নির্বাহী বিভাগ-বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের হাতে অস্বাভাবিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সুবিশাল ভবনের চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সাধারন জনগনের থেকে নির্বাহী বিভাগের দূরত্ব তৈরী হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করবো স্থানীয় সরকার কর্তৃক গ্রাম/পৌরসভা/জেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক। জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোই শুধু নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকবে।

২. জাতীয় সংসদ ঃ

দলীয় পরিচয়ের উর্ধে উঠে জাতীয় সংসদ সদস্যদের এলাকার জনগনের কল্যানে কাজ করতে হবে। নিজ এলাকার জনগনের স্বার্থহানী করে এমন কোন আইন প্রনয়নে কোন সংসদ সদস্য সম্মতি প্রদান করতে পারবে না। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল নয়, বরং জনমতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সেই লক্ষ্যে এবং গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বাস্তবায়নে আমরা সংবিধান থেকে ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করবো।

৩. গণভোট ঃ

একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই জনগনের সরাসরি মতামত গ্রহণ করা যায়। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সংবিধান সংশোধনের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি জনগনের মতামত গ্রহণ করায় বিশ্বাসী। একমাত্র এভাবেই নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে জনগনের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। যেখানে জনমতের প্রাধান্য থাকবে না আমরা অন্যকোন উপায়ে তা বাস্তবায়ন করবো না।

আমাদের বর্তমান সরকারগুলো গণভোট চায় না। এর পিছনে তাঁদের যুক্তি হলো, অনির্বাচিত সরকারসমূহ গণভোটের অপব্যবহার করেছে। কিন্তু অনির্বাচিত সরকারগুলো নির্বাচন ব্যবস্থাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলো, তাই বলে নির্বাচন বন্ধ আছে? সরকার গণভোট চায় না কারণ তাঁরা জনগনের মুখোমুখি হতে ভয় পায়।

৪. বিচার বিভাগ ঃ

রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ হলো বিচার বিভাগ যা আমাদের জনগনের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এতদসত্বেও, লক্ষাধিক মামলা এখনো দীর্ঘমেয়াদে বিচারাধীন থাকছে। তাছাড়া আইনের আশ্রয় নেয়া অধিকাংশ সাধারন মানুষ নানারকম হয়রানি আর ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছে। অথচ আমাদের স্বপ্ন এমন ছিলো না।

বিচার পাওয়া জনগনের মৌলিক অধিকার। আমরা দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের মাধ্যমে স্বল্পোতম সময়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবো এবং স্থানীয় পর্যায়ে আদালতের কার্যক্রম চালু করবো।

নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করা বিচার বিভাগের কাজ এবং আমরা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করবো। বিচার বিভাগে নিয়োগদানের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং জাতীয় সংসদের হাতে বিচারকগণকে

অভিসংশনের ক্ষমতা দেয়া থাকলে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের পক্ষে সম্ভব নয়।

৫. নির্বাচন কমিশন ঃ

আমাদের মত প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে জাতীয় নির্বাচনে জাতির ভাগ্য প্রভাবিত হয়। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। জনগনের ইচ্ছার প্রতিফল ব্যালটের মাধ্যমে নিশ্চিত করানো নির্বাচন কমিশনের পবিত্র দায়িত্ব। এই মহান দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনকে সবসময় যেকোন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে বা জটিলতা থেকে বের হয়ে কাজ করতে হবে।

আমরা নিশ্চিত করবো কোন রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ হবে না। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীন কর্মকান্ড কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার জন্য যাতে না হয়, সেটা আমরা নিশ্চিত করবো। গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা হবে এবং নির্বাহী বিভাগ বা জাতীয় সংসদের প্রভাবমুক্ত রাখা হবে।

৬. স্থানীয় পর্যায়ে জনগনের অংশগ্রহণ ঃ

তৃণমূলেই গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত হয়। আমরা স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবো। প্রতি মাসে স্থানীয় জনগনের সাথে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের টাউনহল সভা আমরা নিশ্চিত করবো। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যতালিকাভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রনয়ন করবো যেখানে জনগন পরিচয় গোপনরেখে ক্ষুদে বার্তা অথবা অনলাইনে তাঁদের মূল্যায়ন করতে পারবে। সরকার হবে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত, জনগনের জন্য এবং জনগনের সরকার।

(গ) গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্রতা হ্রাস ঃ

কিছু রাজনৈতিক দল শুধু ফায়দা লুটার জন্য একথা প্রচার করলেও এটা সত্য, বাংলাদেশের প্রানশক্তি হলো এর গ্রামীন জনপদ। দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী গ্রামীন কৃষি কাজে নিয়োজিত। আমাদের গ্রামীন অবকাঠামো এবং কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়।

আমরা নিশ্চিত করবো গ্রাম এবং শহরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বন্টন হোক। গ্রাম আমাদের বর্তমান আর শহর হলো ভবিষ্যত সম্ভাবনার হাতছানি। গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো আধুনিকায়নের মাধ্যমে পণ্যের বাজার এবং সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে কার্যকর

যোগাযোগ নিশ্চিত করবো। গ্রামীন উন্নয়ন পরকিল্পনা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সম্পৃক্ত করেই আমরা তৈরী করতে চাই, তাঁদের অংশগ্রহনকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

বাজার ব্যবস্থা এবং নাগরিক অধিকার সম্পৃক্ত সকল তথ্যের অবাধ প্রবাহ আমরা নিশ্চিত করবো, গ্রামীন কৃষিপণ্যের সঠিক দাম নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মূল্য কমিশন চালু করবো। আমরা কৃষকদের জন্য পেনশন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করবো। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা জালের আওতায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবো। কোন অবস্থাতেই মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃষকদের জিম্মি করে অনৈতিক মুনাফা লুটার সুযোগ দিবো না।

(ঘ) শিল্প-কারখানার শ্রমিক এবং শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঃ

"উন্নয়নশীল" থেকে "উন্নত" রাষ্ট্রে পদার্পন করতে হলে অবশ্যই আমাদের শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবো, বাজার চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য যথাযথ মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করবো।

নিম্নমজুরির জনগোষ্ঠীর সহযোগীতা ছাড়া কোন শহরই টিকে থাকতে পারে না। শ্রমবান্ধব শ্রম আইন প্রনয়ন এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো। শ্রমিকদের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা জালের আওতায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবো এবং স্বতন্ত্র পেনশন ব্যবস্থা চালু করবো।

(ঙ) আমাদের তরুণ সমাজ ঃ

তরুণরা শুধু আমাদের ভবিষ্যতই নয়, আমাদের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ। এতদসত্ত্বেও, সরকারের নীতি তাদের বিকাশের জন্য যথেষ্ঠ কার্যকর নয়। তরুণদের জন্য আমাদের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়তে তারুণ্যের অবদান নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের বিকাশ এবং উন্নয়নের সব সুযোগ প্রদান করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবো যাতে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হিসাবে তরুণ সমাজ গড়ে উঠে। এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যে তরুণ কৃষিক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে চায় তাঁকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও চাষাবাদ ব্যবস্থা সম্পর্কেই সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষন ও জ্ঞান দেয়া হবে। তরুণরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের পছন্দের পেশা বেছে নিতে পারে, সে সুযোগ তৈরী করা হবে।

উদ্যমী তরুণদের অধিক সুযোগ প্রদান করে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করার উপযোগী করা হবে। আমাদের শিল্প ও বানিজ্যনীতি এমনভাবে প্রনীত হবে যাতে উদ্যোগী ও উদ্যমী তরুণদের প্রতিভা নষ্ট না হয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যানে কাজে লাগে।

রাজনীতিতে তরুণদের অংশগ্রহনকে হানাহানি আর সহিংসতামুক্ত করা হবে, সিদ্ধান্তগ্রহনে তরুণদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হবে। রাজনীতির স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে তরুণ সমাজকে কেউ যেন ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

(চ) প্রজাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতা জনগণের ঃ

আমরা বিশ্বাস করি, সরকারের পরিধি হ্রাস জনকল্যাণকর। সরকারের দায়িত্ব হলো জনগনের জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করা। সরকার কখনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত পরিচালিত হতে পারে না। সরকারই নিশ্চিত করবে সব বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনকল্যানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ব্যবসা করবে, এজন্য সরকার নিজে বাজার প্রতিযোগী হতে পারে না।

কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই আমাদের দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং যেকোন কাজের ব্যর্থতা সহজেই চিহ্নিত করার উপায় রাখতে হবে। এভাবেই আমরা জনকল্যানমুখী শাসনব্যস্থা ধীরে ধীরে চালু করতে পারবো।

১. আমলাতন্ত্র ঃ

বেসামরিক প্রশাসনই সরকারের মূল চালিকা শক্তি। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই চালিকা শক্তির একটি বড় অংশ রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট। আর প্রশাসনের এই সদস্যরা জনগনের স্বার্থ সংরক্ষনের বদলে রাজনৈতিক দলের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। আমরা প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করবো।

নিয়োগ হবে সম্পূর্ন মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। কোটা ব্যবস্থা শুধু মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হবে। পূর্ণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশাসনে পদোন্নতি হবে। সৃজনশীল সেবার জন্য পুরষ্কার আর অদক্ষতার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। নিয়োগ এবং পদোন্নতির সব ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকবে।

২. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ঃ

স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম সব সরকারের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ। গণমাধ্যমকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের ভূল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা গণমাধ্যমের থাকবে, এটা ছাড়া এসব ব্যক্তিরা জবাবদিহিতার উর্ধে থেকে যাবে। জবাবদিহিতার অভাবের সংস্কৃতির ইতিহাস আমাদের দীর্ঘদিনের, এভাবে চলতে দেয়া যাবে না।

৩. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ঃ

প্রযুক্তি উৎকর্ষতা আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে গণমানুষ বিশেষ করে তরুণদের কথা আমরা বেশী শুনতে পাই। গণমাধ্যমের মত সাধারন জনগনেরও মতপ্রকাশের পূর্ণ এখতিয়ার থাকতে হবে। আমাদের মহান সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আমরা নিশ্চিত করবো, সেটা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে হোক অথবা সামাজিক যোগাযোগের

মাধ্যমে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধচারণ করা বা এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়া মানে শুধু সংবিধানের বিরুদ্ধেই যাওয়া না বরং আমাদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা।

(ছ) সামাজিক সুরক্ষা জাল ঃ

১. স্বাস্থ্যসেবা ঃ

জনগনের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার কিছু সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শুধু নামমাত্র। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ অনেকক্ষেত্রেই লোক দেখানো।

আমরা জনগনের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে এবং রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নীতি প্রনয়ন করে চিকিৎসা সেবার অধিকার নিশ্চিত করবো।

বর্তমানে সরকারী কার্যক্রম এবং এনজিও কর্মকান্ডের স্বমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব। জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে এই উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। স্থানীয় সরকারের হাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক এই উদ্যোগের একটি বড় দায়িত্ব দেয়া হবে।

ত্রুটিপূর্ণ এবং নিম্নমানের জীবনব্যবস্থার কারনে গ্রাম এবং শহুরে জনগনের মধ্যে বেশীরভাগ অসুখের বিস্তার লাভ করে। মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাই এই শিক্ষা যাতে বিশ্বমানের হয়। অন্যদেশ থেকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে স্থানীয় জনবলের সাথে স্বমন্বিত উদ্যোগে আমরা বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবো।

২. শিক্ষা ঃ

আমরা সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবো। আমরা বিদ্যালয়ের সার্বিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনবো এবং বর্তমানে অস্বাভাবিক ভাবে উচ্চ গ্রেড প্রাপ্তির ধারাকে বন্ধ করবো। দুঃখজনকভাবে সর্বোচ্চ গ্রেড প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান প্রতিনিয়ত কমছে। সব বিদ্যালয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড প্রনয়ণ করা হবে এবং যথাযথভাবে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা হবে। শুধু পরীক্ষার ফলের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করা হবে না, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন বিন্যাস থাকবে।

রাষ্ট্রীয় সকল নীতিতে শিক্ষানীতির প্রভাব থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষানীতিতে আমরা দুটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিবো- (১) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং (২) জ্ঞান বৃদ্ধি।

দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মকান্ডে আমাদের নীতি থাকবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা এবং লেখাপড়া শেষে অথবা পড়ালেখা চলাকালীন যেকোন সময় তাঁরা যাতে কাজের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করা। স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে।

এতে করে গ্রামীন পরিবারগুলোকে তাঁদের পারিবারিক কর্ম ঐতিহ্য হারানোর ভয় করতে হবে না আর শহরেও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাবে না। জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা উন্নত রাষ্ট্রের পথে আমাদের যাত্রা শুরু করবো। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণামূলক কর্মকান্ডে প্রনোদনা দেবো এবং এভাবেই আমরা বিশ্ব সেরাদের সাথে পাল্লা দেবার মত উপযোগী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবো।

৩. পেনশন ঃ

জাতীয় পেনশন স্কীমের আওতায় আমরা সমাজের কর্মক্ষম সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করবো। গ্রামীন জনগোষ্ঠী এবং শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য বিশেষ প্রাধান্য থাকবে।

(জ) অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ

১. অর্থনৈতিক নীতিমালা ঃ

আমাদের শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহন করা হবে। এই নীতিমালা জনগনকে উদ্যোগী হতে সাহায্য করবে। অঞ্চল এবং শ্রেণীভেদে এই নীতিমালা সুষমভাবে কার্যকর করা হবে। একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থাকে কোনভাবেই উৎসাহিত করা হবে না। একচেটিয়া বাজারের অধিকার ধনী শ্রেণীর হাতে তুলে দেবার অর্থ হলো জাতির সাথে প্রচ্ছন্ন তামাশা করা। এটা শুধু আয়ের অসম বন্টনই সৃষ্টি করে না বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়ও করে।

রাষ্টীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি অত্যানুকূল ব্যাবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আমাদের বিশ্ববাজারে স্থান করে নিতে হবে। কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে আমাদের অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। সাধারন জনগনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সীমা নির্ধারন

করা হবে। জনগনের সম্মিলিত মতামত আর যাচাই এর ভিত্তিতে এসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা তৈরী করা হবে।

নুতন এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করার পরিবেশকে সহজীকরন করা হবে এবং দাপ্তরিক আনুষ্ঠানিকতা ও আনুষাঙ্গিক খরচ কমিয়ে আনা হবে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সহজ শর্তে ঋন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারন উৎসাহিত করা হবে। কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋন সুবিধা প্রদানের বিশেষ প্রনোদনা ব্যাংকিং খাতে দেয়া হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নারী ও পুরুষের সমঅংশগ্রহন নিশ্চিত করা হবে। (কর)

আমাদের বীর জাতি যাতে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব কিছুই করবো।

২. জ্বালানী নীতিমালা ঃ

আমাদের দেশের জনগনের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানী নীতিমালা গ্রহন করা হবে। গত দুই দশকে আমাদের জ্বালানী চাহিদা প্রায় দ্বিগুন হয়েছে এবং চলমান উন্নয়নধারা অব্যাহত থাকলে এই চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র কয়লাভিত্তিক জ্বালানী ব্যবস্থা দিয়ে এই চাহিদা মেটানো যাবে না।

গৃহস্থলীক্ষেত্রে জ্বালানীকে মৌলিক পণ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। একইসাথে, শিল্প-কারখানা, বানিজ্যিক ক্ষেত্র এবং পরিবহন খাতে আমাদের ভবিষ্যত চাহিদা নিরুপন করতে হবে।

পারমানবিক জ্বালানী মধ্যমেয়াদী সমাধান হলেও এসংক্রান্ত কারিগরি জটিলতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হবে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে জ্বালানী চুক্তির ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে।

৩. সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামীন জনপদে বর্তমানে এক লক্ষ কিলোমিটারের কম পাকা রাস্তা রয়েছে, এই অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক।

স্থানীয় সরকারের হাতে গ্রামীন জনপদ উন্নয়নের দায়িত্ব থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যথাযথ সাহায্য করতে হবে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মানের খরচ উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ গুন বেশী, এটা অবশ্যই কমাতে হবে। নৌ-পথ এবং রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও আমরা আধুনিকায়ন করবো।

(ঝ) দূর্নীতি প্রতিরোধ ঃ

দূর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। প্রচলিত আইনের প্রয়োগ এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রনয়ণ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রচলিত সামাজিক রীতির কারনে দূর্নীতি সংগঠিত হয়ে থাকে যা এক ধাক্কায় দূর করা কঠিন। স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এজন্য সবচেয়ে কার্যকর নীতিমালা আমরা গ্রহন করবো। আমরা বিশ্বাস করি না, আইনের যথাযথ প্রয়োগে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করবে। দূর্নীতি বিরোধী অভিযান সাময়িকভাবে স্থবিরতা তৈরী করলেও স্থানীয় সরকারের কার্যকর উদ্যোগে তা মোকাবেলা করা হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দূর্নীতিকে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হবে।

যদি কারো স্বামী/স্ত্রী বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়, তাহলে সে এদেশের প্রশাসনে নিয়োগ পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু সংসদ সদস্যদের বেলায় এমন কোন নির্দিষ্ট আইন নেই বা এর অনুসন্ধান/আইনের প্রয়োগের জন্য কোন সংস্থাও নেই। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করার কোন সুযোগ রাখা হবে না।

বৃহৎ কর্পোরেশনে দূর্নীতির শাস্তি হিসাবে উচ্চ হারে করারোপ এবং সীমিত বানিজ্যিক সুবিধা ও লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতার মাধ্যমে দেয়া হবে। ব্যবসায়িক খরচ বেশী হলে ব্যবসার সাধারন নীতি অনুযায়ীই অনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করতে বাধ্য হবে এসব প্রতিষ্ঠান।

বিশেষ দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দূর্নীতির মামলার বিচার হবে। বিচার বিভাগের ন্যায় এসব ট্রাইবুনাল নির্বাহী বিভাগ অথবা জাতীয় সংসদের প্রভাবমুক্ত হবে। দূর্নীতি দমন কমিশনকেও নির্বাহী বিভাগ অথবা জাতীয় সংসদের প্রভাবমুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের ন্যায় ক্ষমতায়ন করা হবে যাতে দূর্নীতিবাজরা কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে না পায়।

(ঞ) সামাজিক ন্যায়বিচারঃ

১. সম-সুযোগ তৈরীঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগিরকের যেনো সম-সুযোগ থাকে। রাষ্ট্রের প্রত্যেকেই আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও উন্নত জীবনের অধিকারও সবার প্রাপ্য। মৌলিক অধিকারের পূর্ণ নিশ্চিয়তা এবং ইতিবাচক অধিকার সংরক্ষনের সুযোগ একমাত্র রাষ্ট্র তৈরী করতে পারে। আমরা সম্ভাবনাময়ী জাতি। আমাদের গ্রামে-শহরে নেতৃত্ব দেবার মত এবং জাতীর দিশারী হবার মত অসংখ্য সম্ভাবনাময়

প্রতিভা জন্ম নেয় কিন্তু আমরা সেসব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করতে পারি না বলেই জাতি বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষা জাল নিশ্চিত করতে পারলে প্রত্যেক নাগরিক বিকাশের জন্য সমান সুযোগ লাভ করবে।

২. নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

যেকোন পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ জন নারীর মধ্যে চার জনের বেশী নারী কোন না কোন ভাবে গৃহ নির্যাতনের স্বীকার। অসংখ্য নারী ধর্ষন এবং হত্যার মত করুণ পরিনতির মুখোমুখি হয়। আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যাকে শুধু নারী হয়ে জন্ম নেবার কারনে যদি অবহেলিত হয়ে থাকতে হয় তাহলে কিভাবে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবো?

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন না করতে পারলে আমাদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের সংবিধান, ধর্ম বা মানবিক যেকোন দৃষ্টিকোন থেকেও নারীদের বঞ্চনার মধ্যে রাখা গ্রহনযোগ্য নয়। যৌতুকের মত অপরাধসহ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের যেমন কঠোর আইন আছে, তার সঠিক প্রয়োগ ততটাই নিস্প্রভ। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকে এবং খুব কমক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী ন্যায় বিচার লাভ করে। আমরা ছয় মাসের মধ্যে গৃহ এবং যৌন নির্যাতনের মামলার বিচার নিস্পত্তির ব্যবস্থা করবো। নারীদের জন্য বিচারিক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য সহায়ক কার্যকর নীতিমালা প্রনয়ন করে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করবো।

রাষ্ট্রের সব বিভাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা হবে। বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী নিয়োগের জন্য কর প্রনোদনাসহ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(ট) আইনের শাসন ঃ

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারের অন্যান্য অঙ্গের মতই জনগনের সেবার জন্য তৈরী।এই বাহিনীকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবহার করার ফলে জনগন আজ

আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ইংরেজ শাসন আমলের মত জনগন আজ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভয় পায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নিয়োগ এবং পদায়ন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা হবে। স্থানীয় সরকারের জন্য আওতাধীন পুলিশ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে তাঁদের জনগনের কাছাকাছি থাকতে হবে।

নারী পুলিশ কর্মকর্তাদের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে দায়িত্ব দেয়া হবে।

(ঠ) অন্যান্য ঃ

১. সূর্যাস্ত আইন ঃ

আমাদের মহান সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন যাতে প্রণীত না হয় সেটি আমরা নিশ্চিত করবো। রাষ্ট্রীয় জরুরী অবস্থা বা বিশেষ প্রয়োজনে প্রণীত কোন আইন যাতে পরবর্তিতে নিবর্তনমূলক না হতে পারে, সেজন্য ঐ নির্দিষ্ট আইনের সাথে সূর্যাস্ত আইনের ধারা সংযুক্ত করা হবে। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ আইনটি স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যাবে।

২. মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

এনডিএম সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে নির্বাহী বিভাগ এবং মন্ত্রীপরিষদের কর্মকান্ডের মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নপত্র প্রনয়ণ করবে। আমরা প্রতিনিয়ত এই মূল্যায়নপত্র হালনাগাদ করবো এবং বছর শেষে প্রকাশ করবো। একটি দেশের প্রবৃদ্ধি শুধু জিডিপি দিয়েই প্রকাশ পায় না, তাই আমরা মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) এবং জীবনমান সূচক (পিকিউএলআই) ইত্যাদি প্রনয়নের ব্যবস্থা করবো।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম হবে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক ঃ

এনডিএম হবে জনগনের দল। দলের সব কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এনডিএম। স্মার্ট ফোন অ্যাপ, টেক্সট ম্যাসেজ ও ইন্টারনেটের ভিত্তিতে কর্মীদের মতামত গ্রহন

করা হবে। দলের অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র চর্চা সহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক অনন্য উদাহরন সৃষ্টিকারী দল হবে এনডিএম।

(১) দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রার্থী হতে হলে দলীয় 'প্রাইমারীর' মাধ্যমে কর্মীদের ভোটে জয়লাভ করতে হবে।

(২) নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রত্যেককে তাঁর সম্পদের বিবরণ দাখিল করতে হবে।

(৩) স্থানীয় এবং জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হবে।

(৪) কমিটির সব সদস্যকে দলীয় আচরনবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

(৫) নৈতিক অবক্ষয়জনিত যেকোন অপরাধ নির্দিষ্ট দলীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৬) দলীয় তহবিলে গৃহীত যেকোন অনুদানের ব্যাপারে দলের কর্মীরা অবগত থাকবে।

(৭) দলের জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সকল সদস্য ভোট প্রদান করতে পারবে এবং দলের ওয়েবসাইটে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

(৮) ধর্ম-বর্ণ, ভাষা নির্বিষেশে দল কখনোই জাতিকে বিভক্ত করবে না।

(৯) তরুণদের জাতির ভবিষ্যত হিসাবে বিবেচনা করে দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে নির্দিষ্ট বয়সের তরুণদের জন্য স্থান দেয়া হবে।

(১০) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সব পর্যায়ের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যদের স্থান দেয়া হবে।

(১১) কেন্দ্রীয় কমিটির সব পদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে এবং দলের সাধারন সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

(১২) উচ্চ পরিষদের সকল ভাইস-চেয়ারম্যান জাতীয় নীতি-নির্ধারনী ক্ষেত্রে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে।

(১৩) প্রত্যেক জাতীয় কাউন্সিলের পূর্বে নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে দলের বক্তব্য লিখিত আকারে জনসম্মুখে প্রকাশ পাবে।

(১৪) সব পর্যায়ে দলীয় কর্মকান্ড মূল্যায়নের জন্য দল একটি মূল্যায়নপত্র তৈরী করবে।

আমাদের জাতি, আমাদের ভবিষ্যত ঃ

ইতিহাস গড়ার এখনই সময়। এখন সময় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব জনগনের হাতে ফিরিয়ে দেবার। এখন সময় ভালো কিছু অর্জনের জন্য লড়াই করার। আমরা এখন জাতির জন্য যা করবো তাই জাতির ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি নির্ধারন করবে।

আমরা আর রাজনৈতিক সংঘাত চাই না। আমরা শুধু পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে কোন ধরনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া, শুধু সরকার পরিবর্তনের খেলা দেখতে চাই না। আমরা সাত কোটি বাংলাদেশীর মহান আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দিতে চাই না।

আমরা অনেক চড়াই উৎরাই পার করেছি। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম এদেশের জনগনের। মহান আল্লাহ্-রাব্বুল আলআমিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন সঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য, এদেশের গণমানুষের উজ্জল ভবিষ্যত নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন থেকে কেউ বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম সর্বদা এদেশের আপামর জনগনের দল হিসাবে থাকবে এবং জনগনের স্বপ্ন পূরণের অবিচল লক্ষ্যে দুস্তর পথ পাড়ি দিবে।

জয় বাংলাদেশ